বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

দ্বিতীয় প্রবাস - শেষ অধ্যায়

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের নিউ জার্সির লিবার্টি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের টার্মিনাল থেকে শিকাগোগামী প্লেনে ওঠার জন্য খুব বেশি দূর হাটতে হয়নি। কিন্তু মিডল্যান্ডের এম বি এস বিমান বন্দরে যাবার জন্য শিকাগোর সুবিশাল ও'হেয়ার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন বদলাতে হবে এবং এ জন্য টার্মিনাল চেঞ্জ করতে হবে। মচকানো পা নিয়ে এই আজদাহা বিমান বন্দরের এক টার্মিনাল থেকে আরেক টার্মিনালের দীর্ঘ পথ হেটে যেতে পারবো কিনা সে কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম। অন্য উপায় ছিল না তা নয়। হুইল চেয়ার কিংবা আন্তঃটার্মিনাল চলাচলকারী ট্রলিতে চড়ে যাওয়া যেত; কিন্তু সে ভাবে যেতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না। যাই হোক হাতে সময় থাকায় আল্লাহর নাম নিয়ে আস্তে আস্তে হাটা শুরু করলাম এবং যথাসময়ে প্লেনে উঠলাম। স্বল্প পরিসরের এম বি এস বিমান বন্দরের এরাইভাল লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে গাড়ী পর্যন্ত আসতে খুব একটা হাটতে হয়না। তাই পায়ের ব্যথা তেমন কোন ঝামেলা বাধালো না। এয়ারপোর্ট থেকে সোনিয়া আমাদেরকে বাসায় নিয়ে এলো। ঢোকার দরজায় জিবরান আর মিঢ়েয়ার লাগানো রঙ্গীন পোস্টার 'Welcome Nanu and Nana' আমাদেরকে স্বাগত জানালো। প্রবাসে চার মাস নিজেরা সংসার করার পর আবার আমরা মেয়ে-জামাইয়ের অতিথি হলাম।

পঞ্চাশ বছর আগেও বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে শ্বশুর শ্বাশুরীর সাথে জামাইয়ের সম্পর্কটা ছিল formal, আপনি - আজ্ঞের। তখন প্রবাদই ছিল 'জরু, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা'। জামাই হলেন 'দুলামিয়া' এবং শ্বশুর বাড়ীতে তিনি বিশেষ সন্মানিত অতিথি। তিনি পরের ছেলে; দয়া করে কন্যাদায়গ্রস্ত শ্বশুরের মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরকে কৃতার্থ করেছেন। তার আতিথেয়তায় পান থেকে চূন খসলেই বিপদ। সুখের কথা এখন সময় পালটেছে আর তারই সাথে বদলে গিয়েছে মানুষের মন, মানসিকতা এবং চিন্তাধারা। আজকের ভদ্র বাংগালী পরিবারের জামাইদের বেশীর ভাগই ছেলের মতো; তাদের ওখানে বেড়াতে গেলে মনেই হয়না বেড়াতে এসেছি। অন্যের কথা জানিনা তবে আমাদের ক্ষেত্রে সেটা সর্বৈবভাবে সত্যি। আমাদের জামাই নোমান সত্যিকার অর্থেই আমাদের বড় ছেলে; নোমান - সোনিয়ার বাসায় যতবারই গিয়েছি ততবারই মনে হয়েছে এ আমার নিজের ছেলেরই বাসা। এবারও তাই মনে হলো। নাতি-নাত্নী আর মেয়ে জামাই নিয়ে বেশ আনন্দেই সময় কাটতে লাগলো। তবে বাংলাদেশের চলমান ঘটনা আর সে সব ঘটাবার নায়কদের কীর্তিকলাপ অনেকের মতো আমাকেও চরম উদ্বিগ, চিন্তিত এবং ব্যথিত করে তুললো।

আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক - এই নিয়ে চিরদিন আমার একটা প্রচন্ড গর্ববোধ ছিল। সরকারী চাকুরী করার যোগ্যতা থাকলেও তার চেষ্টা করিনি; বিশ্বখ্যাত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে যোগদানের আহ্বানে ও সাড়া দিইনি। 'আমি মানুষ গড়ার কারিগর' এই অভিধায় পরিচিত হবার গৌরব বুকের ভিতর লালন করে শিক্ষক হিসেবেই আমি আমার সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি এবং একটা অনাবিল আত্মতৃপ্তি পেয়েছি। সেই সাথে এটাও অস্বীকার করবোনা যে একটা অহংবোধ এবং আত্মশ্লাঘায়ও আচ্ছন্ন হয়েছি। কিন্তু আজকাল বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হওয়া বিভিন্ন সংবাদ আমার সব গর্ব, আত্মতৃপ্তি এবং গর্ববোধ ভুলুণ্ঠিত করে দিচ্ছে।

কারণ এসব সংবাদের জন্মদাতা এবং নায়ক শিক্ষক নামের কলংক একটি জঘন্য চরিত্রের অমানুষ। সেই কুচক্রী ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ও সেই সাথে স্ব-নিয়োজিত প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজুদ্দিন (নাকি ইয়েস উদ্দিন)! মেরুদন্ডহীন, একটি মহা দূর্নীতিপরায়ন রাজনৈতিক পরিবারের পদলেহী ও মহা তাবেদার, এবং সরকারী সম্পত্তি অবৈধভাবে দখলকারী একজন দূর্নীতিপরায়ন সন্তানের পিতা এই লোকটি নাকি শিক্ষক; একজন প্রফেসর। তার অবিমৃষ্যকারিতা এবং একজন বিশেষ ব্যক্তি, তার পরিবার ও দল তোষণের কারণে দেশ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, অথচ তার কোন বিকারই নেই। সেই কবে রোম নগরী পোড়ার সময় বাঁশী বাজিয়ে রোমক সম্রাট নীরো ইতিহাসের আস্তাকুড়ে স্থান করে নিয়েছে; আমার কেন যেন মনে হয় ইয়েস উদ্দিন সারা বাংলাদেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আর তার জনগণের জান-মাল ধ্বংস করে নীরোর কুখ্যাতিটি অধিকার করতে চাচ্ছে। অবশ্য তাকে দোষ দেয়া যায়না। প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস নোবেল প্রাইজের দৌলতে বিশ্বখ্যাতি পেয়েছেন। প্রফেসর (!) ইয়েস উদ্দিনের তো আর সে মুরোদ নেই, তাই কুখ্যাতিই সই। এই প্রবাসে বসে আমার বলতে ইচ্ছে করছে আসুন আজ থেকে আমরা লিখতে শুরু করি ‘When Bangladesh was burning, Iajuddin was licking someone's .....আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি একজন উচ্চ শিক্ষিত অথচ গন্ডমূর্খ ইয়েসউদ্দীন প্রফেসরের চাইতে একজন অশিক্ষিত পথের ভিখিরির পরিচয় অনেক গর্বের !

বাংলাদেশে বর্তমানে আরো এমন সব আজব, দুঃখজনক, অনৈতিক, অন্যায় এবং তুঘলকী কান্ড ঘটছে যেগুলো ঘটাচ্ছেন ন্যায়দন্ড যাদের হাতে তারা। হ্যাঁ, আমি বিচারক নামধারী বাংলাদেশের কিছু দ্বিপদ বিশিষ্ট আপদের (শ্বাপদ ও বলা যায়) কথা বলছি। এসব ঘটনা এবং যারা তা ঘটাচ্ছেন তাদের প্রেক্ষিতে আরো বহু প্রশ্ন, বহু কথা মনে জাগছে। আমার বাবা একজন সামান্য আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। আমাদেরকে তিনি সব সময় বলতেন বিচারকদের সন্মানই আলাদা। মৃত্যুর পর যেমন মানুষের ভালমন্দ আর ন্যায় ন্যায়ের বিচার করার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন; তেমনি পৃথিবীতে বাঁচাকালীন সময়ে মানুষের ন্যায় অন্যায়ের বিচার করবেন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত বিচারকরা। পৃথিবীর বুকে নির্যাতিত মানুষের আশ্রয় ও ভরসার স্থল আদালত। আদালতের যারা বিচারক, তারা তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সাহস, সততা, ন্যায়-নীতির প্রতি অবিচল আস্থা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে অন্যায়কারীর মনে ভীতি আর মজলুমের মনে আশা জাগিয়ে তোলেন। সেই হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের যারা বিচারক, তারা এক হিসেবে শেষ বিচারের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাই তাদেরকে সম্বোধন করতে হয় ‘মহামান্য আদালত’ বলে। তিনি উদাহরণ স্বরূপ অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে জাস্টিস কায়ানী, জাস্টিস কর্ণেলিয়াস এবং জাস্টিস বি এ সিদ্দিকির নাম উল্লেখ করতেন। তার খুব ইচ্ছা এবং আশা ছিল আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে অন্ততঃ একজন যেন বিচারক হবার স্বপ্ন দেখি। আমার বাবা মারা গেছেন সে আজ প্রায় তিরিশ বছর। তার আশা সফল হয়নি; কারণ আমরা কেউ সে ধরণের স্বপ্ন দেখিনি । এই তো কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাবার ইচ্ছা পূরণ করতে পারলাম না বলে মাঝে মাঝে দুঃখ হতো। তবে ইদানীং সে ইচ্ছা পুরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বড়ই শান্তি এবং স্বস্তি পাচ্ছি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিগত সরকারের ইলেকশন ষড়যন্ত্রের অংশীদার হিসেবে জাস্টিস (!) কে এম হাসান, এম এ আজীজ, মাহফুজুর রহমান, এবং অতি সম্প্রতি জাস্টিস (!) মোদাসসির আহমেদ এবং জাস্টিস (!) ফায়েজী যা সব কান্ড করলেন, তা দেখে মানুষতো কোন ছাড়, ইবলিশেরও ঘাবড়ে যাবার কথা। বাংলাদেশের মানুষদের দুর্ভাগ্য, তাদের শেষ আশ্রয়স্থল এমন সব জাস্টিসদের (!!!) হাতে যাদের চরিত্র, চিন্তা, চেতনা এবং সর্বোপরি নৈতিকতা প্রশ্নবিদ্ধ। ভরসা অবশ্যই একটা আছে; মহা বিচারক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদালতে দুনিয়ার বিচারকদেরও বিচার হবে। কিভাবে হবে সেটা আল্লাহই ভালো জানেন; তবে কেন যেন একটা গানের লাইন

বার বার কানে ভেসে আসছে - 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা, ঠিক জেনো তা, এই জনতা ....।

মিডল্যান্ডে এসে পৌছানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই ঈদুল আজহা এসে গেল। সোনিয়ার বিয়ের পর এক যুগেরও বেশি সময় কেটে গেছে; কিন্তু ছেলে, মেয়ে, জামাই, নাতি, নাতনীদের নিয়ে আমাদের একসঙ্গে ঈদ করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তাই শেরিফের বিয়ের পরপরই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এবার আমরা সবাই মিলে সোনিয়া-নোমানের বাসায় কুরবানীর ঈদ উদযাপন করব। পূর্ব পরিকল্পনামতো এ উপলক্ষ্যে শেরিফ সিডনী থেকে বষ্টন এলো এবং সেখান থেকে সাবাহকে নিয়ে ঈদের অনুষ্ঠানে সামিল হলো। টরন্টো থেকে রাকিম আর এহসানের পরিবারও আমাদের সাথে যোগ দিল। সকালে আমরা দল বেধে মিডল্যান্ডের পাশের শহর সাগিনোতে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়লাম। এক আফ্রিকান আমেরিকান ইমাম অত্যন্ত অদ্ভুদ সুরে, এবং সমাগত অধিকাংশ নামাজীদের বিচারে ভুল উচ্চারণে, অসম্পূর্ণ আয়াতের সুরা দিয়ে ভুল কায়দায় সে নামাজের জামাত পরিচালনা করলেন। নামাজ শেষে তার খুৎবা শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। কারো ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। কিন্তু একজন মুসলমান হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে আমি গর্ববোধ করি এবং ইসলামের আইন অনুশাসন মেনে চলতে চেষ্টা করি। ইসলাম সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট উৎসাহ, আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসা আছে । আর সে জন্য আমি ইসলাম, এর রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং ইসলাম সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে মোটামুটিভাবে পড়াশুনাও করে থাকি। কিন্তু আজকের ঈদ-জামাতের ইমাম সাহেব কুরবানী এবং আনুসংগিক বিষয়ে যে সব বক্তব্য রাখলেন সে সবই বড় বিচিত্র এবং অবিশ্বাস্য ধরণের। আমার জানামতো এ বক্তব্য মূলধারার সুন্নী মুসলিম আলেম ওলামাদের ধ্যান ধারণার সাথে সামঞ্জস্যহীন। কে জানে এই ইমাম সাহেব এলিজা মুহাম্মদের প্রবর্তিত এবং বর্তমানে লুই ফাররাহ খানের নেতৃত্বাধীন Nation of Islam এর দলভুক্ত কিনা। সত্যি বলতে কি সবাই এক রকম মন খারাপ করেই বাসায় ফিরে এলাম। নিউ ব্রানস উইকে ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়ে খুব ভাল লেগেছিল।

নবদম্পতি শেরিফ আর সাবাহকে ওদের মিডল্যান্ডের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য নোমান আর সোনিয়া সেদিন ওদের বাসায় 'ওপেন হাউজের' আয়োজন করেছিল। স্থানীয় বাংলাদেশী এবং পশ্চিম বাংলার অনেক কটি পরিবারকে তাতে আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। দুপুর বেলা থেকে অতিথিরা একে একে আসতে শুরু করলেন। সারাটা দিন বড় ভালো কাটলো; ছেলে মেয়ে আর আত্মীয়স্বজনদের সাথে ঈদ উদযাপন করার যে আনন্দ আনেকদিন আগেই ভুলে গিয়েছিলাম বহু বছর পর আজ আবার সে আনন্দের স্বাদ পেলাম। কিন্তু সে সাথে বিষাদে মন ছেয়ে গেল। পরদিন থেকেই সাবাহকে অফিস করতে হবে আর তাই শেরিফকে নিয়ে ও পরদিনই বস্টন চলে যাবে। রাকিম আর এহসানেরও বেশীদিন থাকার উপায় নেই, ওদেরও যার যার কাজে ফিরতে হবে। পরদিন, ২০০৭ এর প্রথমদিন, ওরা ও টরন্টো চলে যাবে। জানি, আসার পর যাওয়া আছে, আছে সুখের পর দুঃখ। আরো জানি একদিন আমাদের উত্তরসূরী, আমদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে এই পৃথিবী থেকেই চির বিদায় নিয়ে যেতে হবে। অনাদিকালের স্রোতবাহিত মানব ইতিহাসের এই যে পরম্পরিত জীবনধারা অনন্তের পথে ধাবমান, তাকে আটকানো যায়নি, যায়না এবং কখনো যাবেও না। এটাই তো জীবনের অমোঘ সত্য; আর বাকী সবই তো মায়া। তবু, এতো কিছু জেনেও, প্রিয় জনকে ছাড়তে মন কাঁদে।

পহেলা জানুয়ারী রাতে ছেলে-ছেলের বৌ, মেয়ে -জামাই এবং নাতি নাত্নী নিয়ে আমরা সবাই বাইরে একটা মঙ্গোলিয়ান রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম। কাল, দোসরা জানুয়ারী দুপুরের র মধ্যে শেরিফ সাবাহ চলে যাবে। আবার কবে সবাই একসাথে হতে পারবো কে জানে। পরদিন সকালেই বাসা খালি হয়ে গেল। শুরু হলো

বৈচিত্রহীন একঘেয়ে জীবন। সকালে নোমান সোনিয়া অফিসে চলে যায়। আমি আমার ল্যাপটপ খুলে বসি; ইন্টারনেট ব্রাউজ করি, ই-মেল চেক করি। মাঝে সাঝে একে ওকে ফোন করি। আমরাও কয়েকদিনের মধ্যেই সিডনী রওয়ানা হয়ে যাব, তাই নাসিম বাক্স পেটরা গোছগাছ করে। আজকাল বিমান ভ্রমন - হোক সে আন্তর্জাতিক কিংবা আভ্যন্তরীন - বড় হ্যাপার ব্যাপার। ব্যাগেজের সংখ্যা, ওজন, আয়তন ইত্যাদি নিয়ে নানাধরণের কড়াকড়ি। আমাদের বরাদ্দ চার সুটকেস আর দুই হ্যান্ডব্যাগ, কিন্তু তাতে ভরার বস্তুর অভাব নেই। তাই বাক্স পেটরা গোছানোতে বেশ সময় লেগে যায়। নাসিম বারবার, বিভিন্ন ভাবে, নিয়ে যাবার বস্তু সমূহের বিভিন্ন combination করে এই সব সুটকেস ভরে, ওজন নেয়,খালি করে আবার ভরে। আমি তাকিয়ে দেখি আর দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে যাই। আমার চোখে এবারের প্রবাস জীবনের হাজারো খন্ডচিত্র চোখে ভাসে। সে চিত্রের কোনটার আমিই শিল্পী আবার কোনটার আমি দর্শক।

এবারের আমেরিকা প্রবাসে নানাসূত্রে অনেক আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্বল্প কিংবা বহু পরিচিত এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত অনেক বাংগালীর সাথেই দেখা হয়েছে। জন্মভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের আমেরিকা নামক মায়ামৃগের হাতছানিতে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের কাছের-দুরের যে সব মানুষ এদেশে এসেছেন তারা বর্তমানে কেমন আছেন? কতটা ভালো আছেন? এসব প্রশ্নের জবাব জানতে চাইলে স্বাভাবিক ভাবেই কোন generalized জবাব পাওয়া যাবেনা। প্রতিটি মানুষ আলাদা; তাদের চরিত্র, চাহিদা, সাধ, আহ্লাদ ভিন্ন আর তাই তাদের চাওয়া পাওয়ার হিসাবও ভিন্ন। জানা কথাই একেক জন একেক ধরণের জবাব দেবেন। সব চেয়ে বড় কথা আমি এ প্রশ্ন করার কে? সে দিক দিয়ে বিচার করলে এ প্রশ্ন না করাই ভালো এবং আমি তা করতেও চাই না। কিন্তু গত চারমাসের এই আমেরিকা প্রবাসে দেখলাম অতি সাধারণ সৌজন্য মূলক প্রশ্ন ‘কেমন আছেন’ এর জবাবে অনেকে বলছেন ‘খুব ভালো আছি, এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না’; ‘আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ খুব ভালো রেখেছেন’ অথবা এ জাতীয় অন্য কোন ইতিবাচক জবাব। ভাবখানা এমন যে ‘আমেরিকায় আছি, খারাপ থাকবো কেনো? পূর্ব পরিচিত বহুজন, কিংবা প্রথম দেখা বাংগালী ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টের মালিক, ওয়েটার - ওয়েট্রেস, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী অনেকেই আমাকে বলেছেন তারা ‘খু-উ-ব ভালো আছেন’। কিন্তু তারাই আবার কথায় কথায় এমন সব প্রসংগ বা বিষয় নিয়ে তাদের দ্বিধা, দুঃশ্চিন্তা বা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাতে তাদের ‘খুব ভালো আছি’ উত্তর কতটা সত্যি সে ব্যাপারে মনে সন্দেহ জেগেছে; মনে হয়েছে তারা আদপেই খুব ভালো নেই। এমন ধারা স্বতঃস্ফুর্ত ঈর্ষা জাগানিয়া জবাব দেবার কারণ মনোবিজ্ঞানীরা ভালো বলতে পারবেন, তবে আমার কেন যেন মনে হয়েছে এই সব উত্তর দাতাদের অধিকাংশই একটা মেকি বা চুনকাম করা নকল আবরণে নিজেদেরকে ঢেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করার প্রয়াস পাচ্ছেন। হয়তো বা এদেশে আসার পেছনে তাদের জীবনের যা মোক্ষ বা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সেটা অর্জন করতে না পারার ব্যর্থতা ঢাকার জন্যই তাদের এই মিথ্যের বাতাবরণ। কে জানে এর সঠিক কারণ কি?

আবার বিত্ত বৈভব অর্জন করেছেন অঢেল এমন অনেককে বলতে শুনেছি তারা মানসিক ভাবে ভালো নেই; তারা নাকি মরে বেঁচে আছেন। অর্থ, বিত্ত, প্রতিষ্ঠার পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কখন যে তাদের মনটা মরে গেছে তারা তা বুঝতে পারেন নি। অনেকে আবার এও বলেছেন যে টিকে থাকার সংগ্রামে মগজ দরকার, মন নয়। শাশ্বত বাংগালী মনটাকে গলাটিপে না মারতে পারলে এদেশে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়না। এদের অধিকাংশই প্রথম প্রজন্মের successful বলে পরিচিত প্রবাসী। এরা না ঘরকা, না ঘাটকা; এরা না ছাড়তে পারছেন তাদের বাংগালীত্ব না হতে পারছেন আমেরিকান। তাদের অনেকেরই দুঃখের উৎস তাদের সন্তানদের আমেরিকান জীবন ধারার প্রতি উদগ্র ভালোবাসা। এই সব ছেলে মেয়েদের একটা বিরাট অংশ নিজেদের পছন্দমত স্বজাতি বা ভিন জাতির মুসলমান বা অমুসলিম

মেয়ে বা ছেলেকে বিয়ে করছে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারছে না। তাদের অনেকেরই বিবাহ ভেংগে গেছে বা যাচ্ছে। প্রবাসীদের এই দলটির যে চাকচিক্য দিনের আলোয় মানুষের চোখ ধাঁধাঁয়, রাতের অন্ধকারে সে চাকচিক্যই তাদেরকে কঠিন ভাবে ব্যঙ্গ করে তাদের চোখ ভেজায়। ঘুমহীন রাতে বিছানায় শুয়ে তারা এপাশ ওপাশ করেন আর জীবন খাতার হিসাব মেলাতে চেষ্টা করেন।

জীবন অংকের হিসেবে চলেনা, জীবনের সমীকরনও তাই ভিন্ন। খুব সম্ভবতঃ ৬ই জানুয়ারী দুপুর বেলা আমার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু সাইদ হাসান আমাদের সাথে দেখা করতে এলো। আমার জানামত আমাদের সমসাময়িক বন্ধুদের মধ্যে সাইদ হাসানই প্রথম আমেরিকায় আসে। ও সপরিবারে টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকে। কিন্তু free lance consultant হিসেবে কাজের সুবাদে মাসের আধেকটা সময় সাইদকে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে কাটাতে হয়। ও বলছিল আমেরিকায় প্রথম প্রজন্মের বাংগালী অভিবাসীদের অনেকের ক্ষেত্রেই জীবন সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা আসার সাথে সাথে অন্তহীন নিঃসঙ্গতাও এসে গেছে। অনেকেরই তখন মনে হয়েছে আর কত; এবার দেশে ফিরে যাই। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠেনা; নিঃসঙ্গতা নিয়েই মরার মতো বেঁচে থাকতে হয়।

এবারে আমেরিকায় এসে এমন কিছু লোকের সাথেও দেখা হল যারা জন্মসুত্রে Muslim, তবে মহাশক্তিধর প্রেসিডেন্ট বুশ সাহেবের দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে এরা Buslim হয়ে গেছেন। এদের সাথে সামান্য আলাপ- সালাপে পরিস্কার বোঝা যায় যে মুসলমান নিধনের যে নীতি বুশ-চেনী-রাইস এবং তাদের সহযোগী ব্লেয়ার-জ্যাক স্ট্র-এহুদ ওলমার্ট দের সরকাররা গ্রহন করেছেন সেটাই সঠিক। তাদের মতে মুসলমানরা আসলে অসভ্য, আতংকবাদী "and they deserve this"; তারা নিজেদের মুসলিম পরিচয়ে অতিশয় লজ্জিত। এদের অনেকে তো আবার নামই বদলে ফেলেছেন; জাকির হয়েছেন জ্যাকি, রফিক হয়েছেন রাফ আর আলেয়া হয়েছেন লিয়া। তারা ভুলেই গেছেন যে হিরোশিমা বা নাগাশাকিতে যারা আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা এবং পঙ্গু করে ফেলেছিল তারা মুসলমান নয়, আমেরিকান। আবার এদের সম্পুর্ন উলটো চিন্তাধারা পোষণ কারী প্রচুর লোকও দেখেছি যারা মনে করেন ভবিষ্যতে এই আমেরিকাকে মুসলিম দেশ বানাতে হবে এবং সে জন্য এদেশে বসবাসকারী প্রতিটি মুসলমান দম্পতির উচিৎ প্রতি বছর সন্তানের জন্ম দেওয়া। এরা পয়সা খরচ করে বাংলাদেশ থেকে দেলওয়ার হোসেন সাইদী জাতীয় জ্ঞানপাপী, ধর্মব্যবসায়ীদের নিয়ে এসে তাদের বক্তৃতা শোনে। এরা বাইরের লেবাসে কট্টর আল্লাহ ওয়ালা বলে নিজেকে জাহির করেন অথচ নিয়ত এমন সব কাজ করেন যেগুলো কোন বিচারেই ভালো কাজ বলে বিবেচিত হতে পারেনা। এমন বাংগালীর সাথেও পরিচিত হয়েছে যিনি বাংগালী বলে পরিচয় দিতে কিংবা বাংলা বলতে লজ্জা পান এবং পাকিস্তানী বা আরবীদের সাথে মেলামেশা করতে পছন্দ করেন।

আমেরিকায় আওয়ামী লীগ আছে, আছে বি এন পি, জামাত, জাতীয় পার্টি এবং বাংলাদেশের অন্যান্য সব রাজনৈতিক দল। নিউইয়র্কে দেখেছি এসব দলের অধিকাংশ নেতাদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাবোধ শুন্য। সেখানকার বাংলা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন খবর পড়ে জানা যায় যে 'জননেত্রী', 'দেশনেত্রী' বা 'পল্লীবন্ধু'র চামচা এই সব নেতাদের বেশির ভাগই দলাদলি, চুলাচুলি, হাতাহাতি, মারামারি জাতীয় সব কিছুতেই সিদ্ধহস্ত। এদের অনেকেই নাকি দুর্নীতির রানী এবং জননী, যুবরাজ, এবং তাদের অমাত্যবর্গের অতি কাছের লোক। আমেরিকায় বসেও নাকি তারা তাদের গুরু মা এবং গুরু ভাইয়ের নাম বেচে সন্ত্রাস, চুরি-চামারী এবং লোক ঠকানো পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছেন। ঢেকি নাকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে; বাংগালী চরিত্রও আমেরিকায় এসে খুব বদলেছে এমন বলা যাবেনা।

আসলেই কি মানুষ তার চরিত্র বদলাতে পারে? সে পারার সীমা কতদূর? আমি মনে করি আমার ত্রিশ বছরের প্রবাসী জীবনে আমি মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা এবং

চলন-বলনে অনেকটাই বদলে গেছি, আমার স্ত্রী বলেন আমি গায়ে গতরে স্ফীত হয়েছি, কিন্তু আমার আচার-আচরণে এবং ধ্যান-ধারণায় তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। আমি সেই ঢিলে ঢালা বাঙ্গালই রয়ে গেছি। কে সত্যি, কার দর্শন সঠিক এবং কে কিভাবে পরিবর্তন মাপেন কে জানে। চারমাস খুব বেশি সময় নয় এবং সেই স্বল্প সময়ের অভিজ্ঞত প্রসূত ধারণা শুদ্ধই হবে তেমন কোন দাবীও আমি করিনা। তবে বলতে দ্বিধা নেই আমার মনে হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে যেসব বাংগালীরা আমেরিকায় প্রবাসী এবং যারা সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাদের অনেকের মধ্যেই বাংলাদেশে বসবাসকারী বাংগালী বা অন্য কোন দেশে প্রবাসী বাংগালীদের প্রতি কিছুটা উন্নাসিকতা রয়েছে।

জানুয়ারী মাসের ন'তারিখে আমাকে চাকুরীতে যোগ দিতে হবে। সাতই জানুয়ারী আমাদের সিডনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবার কথা। আগের রাত থেকেই জিবরান মিঢ়েয়ার মন খুব খারাপ - why Nana and Nanu have to go? Why can't Nana find a job here? আমাদেরই কি মন খুব ভালো? নাসিম তো সারা রাত এপাশ ওপাশ করেছে। বাচ্চারা অনেক অমনোপূতঃ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে; বড়রা পারেনা। তবু 'আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়' বলার অনাকাংখিত সেই দিনটি এলো। আমাদের ফ্লাইট বিকেল চারটেয়, তিনটের মধ্যে চেক ইন করতে বলা হয়ছে। লাঞ্চের পর পরই আমরা বাসা থেকে রওয়ানা হয়ে এম বি এস এয়ারপোর্টে এলাম এবং যথারীতি চেক ইন সারলাম। সাড়ে তিনটেয় যখন আমাদেরকে প্লেনে board করতে বলা হোল তখন হঠাৎ করেই যেন দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। ঝাপসা চোখেই পেছন ফিরে তাকালাম; সোনিয়া আর নোমান ওদের দুই সন্তান জিবরান আর মিঢ়েয়াকে নিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা নিশ্চিত জানি আমরা ওদের দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত ওরা ওখানেই থাকবে।

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটি' বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)